তারিখ ০৩.১২.২০০০
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ভোরের কাগজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা : একটি সমীক্ষা

যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে প্রতিষ্ঠানটি অনেক দূরে পরে গেছে।

আজ সেশনজট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি, পক্ষান্তরে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট অনেক কমিয়ে ফেলেছে। ১৯৯৯ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই এ বছরের শেষের দিকে বা আগামী বছরের প্রথম দিকে শুরু হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং শিক্ষার মান সাংঘাতিকভাবে নিম্নমুখী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামগঞ্জে বহু কলেজে সম্মান ও মাস্টার্স, কোর্স চালু করেছে। যে কলেজে কোনো একটি বিষয়ে ২০টির বেশি সম্মান শ্রেণীর ছাত্র পড়ানোর facility নেই সেখানে ৮০ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০টির ওপরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে লেখাপড়া ও ব্যবহারিক ক্লাস এক রকম হয় না বললেই চলে। এছাড়া এ সমস্ত কোর্স পড়ানোর জন্য যে মানের শিক্ষক দরকার তা নেই। এমনো ঘটনা ঘটে যে, একজন শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ অথবা যে সমস্ত কলেজে সম্মান কোর্স নেই, সে সমস্ত কলেজে ২০/২৫ বছর চাকরি করার পর যখন বদলি হয়ে সম্মান বা মাস্টার্স ডিগ্রি পড়ানো হয় এমন কলেজে আসেন তখন তার জন্য এ সমস্ত আধুনিক কোর্সে পড়ানো খুবই অসুবিধা হয়। এছাড়া এ সমস্ত বহু কলেজে বহু উচ্চ মাধ্যমিক শাখাও রয়েছে। ফলে বছরে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কম করে সাতবার পরীক্ষা নিতে হয়। এতে ৭ মাসেরও বেশি সময় শিক্ষকরা পরীক্ষা নিতেই ব্যস্ত থাকেন। পড়াশোনা ও ব্যবহারিক ক্লাস কখন নেবেন শিক্ষকরা? ছাত্রদের না পড়েই তত্ত্বীয় পরীক্ষা এবং সারা বছর ব্যবহারিক ক্লাস না করে ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসে সেগুলোর কয়েকটির জন্য অনুশীলন দেওয়া হয়। ফলে উক্ত ছাত্রকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ দিতে কলেজ প্রশাসন তথা বিভাগগুলো বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ এ সমস্ত ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া না শিখে পরীক্ষায় পাস করছে এবং চাকরির সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে যাদের মামা বা বাবার প্রভাব আছে তারা চাকরিও পাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া যদি চলতেই থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা কি আশা করবো।

বিভিন্ন বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রথা চালু আছে। যে বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মনোনীত বিশেষজ্ঞ থাকেন। সে বিশেষজ্ঞের ভ্রমণ ভাতা ও খরচাদি কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী প্রদান করে থাকেন। সাধারণত নির্বাচনী বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ যানবাহনের ব্যবস্থা করেন এবং কাজ শেষে একটি খাম হাতে ধরিয়ে দেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলেজ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে হয়। কারণ নিয়োগের আগেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে donation-এর অঙ্গীকার করা থাকে। যার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ পান না। অর্থ ও রাজনৈতিক চাপ এ দুটির জোর যার বেশি থাকে তিনিই নিয়োগ পান।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি কলেজ যে সমস্ত বিষয়ে সম্মান বা মাস্টার্স কোর্স চালু আছে তাদের গবেষণাগারগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। সরকারি কলেজগুলোতে এক একটা বিভাগে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা মাত্র বাৎসরিক মঞ্জুরি আসে। এ টাকায় একটা বিভাগের গবেষণাগার চালানো অসম্ভব। ফলে ছাত্রদের কাছ থেকে এককালীন বা বাৎসরিক ফি নেওয়া হয় গবেষণাগার চালানোর জন্য। এটা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এ অবস্থাটা কি খুবই সুখকর।

কেন এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে? যখন কলেজগুলো ঢাকা, রাজশাহী বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল তখন তা এতো সহজে affiliation পাওয়া যেতো না। কারণ ওই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগুলো খুবই ক্ষমতা সম্পন্ন। সুতরাং বিভাগ, ডিন, শিক্ষা পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে এ অনুমতি সম্ভবপর ছিল না। তার ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিন্ডিকেটেরও অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য একক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। যদিও সিন্ডিকেট আছে তথাপি রাজনৈতিক চাপে তাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নতি স্বীকার করতে হয়। পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিভাগে যে আসন সংখ্যা তার তুলনায় এ সমস্ত কলেজের অনেকগুলোতেই বিভিন্ন বিষয়ে আসন সংখ্যা অনেক বেশি।

এরপর আছে বিভিন্ন পরীক্ষার কমিটি গঠন ও ফলাফল প্রস্তুত। সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয়। এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় দলীয় প্রাধান্য অগ্রাধিকার পায়। কমিটিগুলোতে সাধারণত ঢাকা ও ঢাকার বাইরের সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ফলে পরীক্ষক নিয়োগ, ফলাফল প্রস্তুতের জন্য টেবুলেশন করা অনেকাংশে সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় সেশনজট বেড়ে যাচ্ছে। এমনো ঘটছে যেকোনো একটি চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই পরবর্তী বৎসরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে উক্ত পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এছাড়া ডিগ্রি পাস পরীক্ষার সব পরীক্ষকের কাছ থেকে নম্বর পেতে দেরি হওয়ায় কিছু রোল নম্বর স্থগিত রেখে বাকি ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে উক্ত ছাত্রছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর শরণাপন্ন হয়ে টাকা-পয়সা খরচ করে পরবর্তী সময়ে তাদের ফলাফল প্রকাশ করাতে সক্ষম হচ্ছে।

এখনো যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ না হন তাহলে দেশের ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। আশা করি, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ নেবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ড : মুঃ সায়দুল ইসলাম
রসায়ন বিভাগ, রাবি।